এই সময়

* কথাসরিৎ *

আমরা যা ব্যক্তিগত ভাবে জানি, তাকেই ভালোবাসি। এবং আমরা খুব বেশি কিছু জানি না। কাজেই জনজীবনে, সভ্যতা পুনর্নির্মাণে তার থেকে একটু কম নাটকীয় ও আবেগনির্ভর কিছুর দরকার। যথা, সহিষ্ণুতা।

— ই এম ফরস্টার

রাস্তা রোকো?

বিবেকানন্দ ব্রিজ ওরফে বালি ব্রিজ কী, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। বালি ব্রিজ কেন, তা নিয়ে অবশ্য সামান্য বহুমতের অবকাশ থেকে যায়। মুখ্যত নদী পারাপারের জন্যই যে এই সেতুটির উৎপত্তি ও বিকাশ, তা সুবিদিত। পাশাপাশি এই সেতুর উপরে প্রাতর্ভ্রমণ, যুগলচলন তথা সিনেমার শুটিংয়ের মতো আরও কিছু কাজকর্ম হয়ে থাকে। এমনকী অমিতাভ বচ্চনের মতো দেশবিখ্যাত তারকাও সেখানে শুটের জন্য হাজির হন। অবশ্য অন্য যে কোনও সেতুর মতোই বালি ব্রিজেরও মুখ্য উপযোগিতা নিঃসন্দেহে যান এবং জনচলাচল। বাকিগুলি সে তুলনায় নিতান্ত পার্শ্ব-ক্রিয়ার মতো, যদি কোনও কারণে না-ও হয়, দৈনন্দিন জনজীবনে বিপুল কোনও প্রভাব পড়বে না। একই সঙ্গে, কোনও কারণে যদি যানচলাচল রুদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে জনজীবন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। চলতি বছরের গোড়াতেই একটি কাজের দিনে এই ভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে বালি ব্রিজে একটি শুটিংয়ের কারণে। অভিনেতার নামটি অবশ্য সুপরিচিত। অমিতাভ বচ্চন। তিনি সম্মাননীয় নিঃসন্দেহে, তাঁর শুটিং ইউনিটের অন্য সকলেই যথেষ্ট সমাদরযোগ্য— কিন্তু সেই সমাদরের কারণে রাতভোর থেকে সকালের ব্যস্ত সময় পর্যন্ত শুটিংয়ের কারণে বালি ব্রিজকে রুদ্ধ রাখার কোনও হেতু পাওয়া মুশকিল। বস্তুত, অসম্ভব। তার কারণ এই নয় যে, বালি ব্রিজে শুট করা অনুচিত। লোকেশন হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন সেতু, আসলে বিভিন্ন জনস্থানই নিয়মিত ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমনকী শুটিংয়ের কারণে খ্যাতিপ্রাপ্তও হয় নানা সময়। তবে, সেই সব শুটিংয়ের জন্য দৈনন্দিন যানচলাচল ভয়ানক ভাবে বিপর্যস্ত হয় কি না, তা বলা কঠিন।

স্বচ্ছন্দে যাতায়াত যে একটি বিশেষ গণপরিষেবার তুল্য এবং সেই পরিষেবাটি নাগরিকের প্রাপ্য, সে তথ্য বঙ্গের পশ্চিমভাগে সর্বদা যে স্মরণে রাখা হয়, এমন নয়। রুদ্ধ বালি ব্রিজ একটি উদাহরণমাত্র। সিনেমার খাতিরে নয়, বিভিন্ন সময় রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই বিভিন্ন রাস্তায় মেরামতির কাজ চলে। তখন দিনের ব্যস্ততম সময়েও সেই সব মেরামতির কাজ চলতে দেখা যায়, যেগুলি গভীর রাতে পথ তুলনামূলক ভাবে ফাঁকা থাকার সময়ও হয়তো করা যেত। তৎসত্ত্বেও, সুদীর্ঘকাল ধরে যে দিবালোকেই রাস্তা মেরামতির কারণে কলকাতা অচল হয়, তা প্রমাণ করে জনতার দৈনন্দিন অসুবিধা যথাযথ গুরুত্ব পায় না। বালি ব্রিজের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। শুটিংয়ের জন্য কেন যানচলাচল উৎসন্নে যাবে, তার সদুত্তর পাওয়া মুশকিল। অভিনেতাটি ভারত তথা ভুবনবিখ্যাত হলেও মুশকিল।

ভিত

সম্প্রতি আর একবার এই শহরবাসীকে ভোরবেলার কাঁচা ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসতে হল। ক্ষয়ক্ষতি এতই সামান্য যে উল্লেখযোগ্য নয়, তবে ফের একবার, মণিপুরের মতো দূর দেশের বদলে কাছাকাছি যদি ভূমিকম্পের উৎসস্থল যদি হয়, তা হলে ঠিক কী ঘটবে এইটি জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এ শহরের তলাকার মাটি শক্ত পাথরের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে নেই, থকথকে কাদায় কম্পন আটকে পড়ে, ঘুরপাক খায়, ঝটকার পর ঝটকায় ঝুপড়ি থেকে ইমারত সব কিছুই ধসিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে। জনাকয়েক বাঙালি বিজ্ঞানী আগাম ইঙ্গিত দেওয়ার কল বসিয়ে আন্তর্জাতিক প্রশংসা অর্জন করেছেন, তবে সেইটি দিয়ে এঁটেল মাটির স্তরে বদল ঘটানোর উপায় নেই, ধাক্কা সামলানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যেটুকু যা হয়েছে, সেটুকু কাজে লাগানোতেও বাঙালির বড়োই আলসেমি।

সংখ্যাগুরুবাদের চাপে সংখ্যালঘুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলেই 'সহিষ্ণুতা' শব্দটির প্রয়োজন হয়

গণতন্ত্রে 'সহ্য করা'র প্রশ্নটা আসছে কী ভাবে?

ভারতের সংবিধানে সহিষ্ণুতা, অসহিষ্ণুতা শব্দ দু'টি একবারও ব্যবহার হয়নি। এসেছে সমান অধিকারের প্রসঙ্গ। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

অরুণদ্যুতি দাস বসু

নভেম্বর মাসে, হিন্দি সিনেমার তারকা অভিনেতা, আমির খানের বক্তব্য নিয়ে সংবাদমাধ্যম তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। সাংবাদিকদের পুরস্কার বিতরণের এক অনুষ্ঠানে কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনে উনি তাঁর স্ত্রী, কিরণ রাও-এর এক নিরাশাপূর্ণ মুহূর্তের কথা বলেছিলেন যেখানে কিরণ রাও দেশের হালহকিকত ভালো না মনে করে দেশ ছাড়ার কথা একবার ভেবেছিলেন। এ রকম একটা দৃশ্য দিয়েই বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে ১৯৯৩ সালের গোড়ায়, মুম্বইয়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত মহেশ ভাটের 'জখম' (১৯৯৮) সিনেমা শুরু হয়েছিল; যেখানে এক বলিউড তারকার স্ত্রী, তাঁর সন্তানকে এমন একটা দেশে লালন পালন করতে চান না যেখানে 'ধর্মের নামে ছুরি চলে'। সেই একই রকমের নিরাপত্তাহীনতার কথা আমির খান ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সিনেমার নায়কের মতোই আমির খান কিন্তু নিজে দেশ ছাড়ার কথা ভাবেননি। বরং দেশের সেই বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করার সাহসী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু আমির খানের বক্তব্য শুনে কেন্দ্রের শাসক দলের কিছু সাংসদ ও মুখপাত্র আমির খান ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বক্তব্য অত্যন্ত আপত্তিজনক, কুরুচিপূর্ণ ও ব্যক্তিগত কুৎসার পর্যায়ে পড়ে। বিহার নির্বাচনে লজ্জাজনক হারের পরে আমির খানের মতো কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া'র একজন দূত এমন একটা কথা বললেন যা কেন্দ্রের শাসক দলের একাংশের কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো বেশ 'বিস্ময়কর' লেগেছে। তাই আমির খানকে তাক করার মধ্যে বিফলতা-উদ্ভূত এক নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে আমির খান ও তাঁর স্ত্রী তো দেশ ছাড়ছেন না বলে পরিষ্কার বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনকে ফাঁকি দিয়ে দাউদ ইব্রাহিম ও ললিত মোদী যে ভারত ছেড়ে বিদেশে আরামদায়ক জীবন কাটানোর খবর মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী করছেন? দাউদ এবং ললিত মোদীর মতো আসামিকে কেন দেশে ফেরানো হচ্ছে না?

তবে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী হিংসার কথা মাথায় রেখে আমির খান নিজের বক্তব্যে কেন 'সহিষ্ণুতা/ অসহিষ্ণুতা' বিতর্কের প্রসঙ্গ তুললেন তা বোঝা গেল না। আমাদের দেশ ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তা মানুষের বেঁচে থাকার, স্বাধীন মতপ্রকাশ ও নিজ মতে জীবনযাপন করার 'মৌলিক অধিকারের' উপর হস্তক্ষেপ। এগুলো একটা পরিকল্পিত রাজনৈতিক ছকের অংশবিশেষ। সেই রাজনৈতিক ছক বিরোধী মতের টুঁটি চাপার ছক। ওই ঘটনাগুলো সহিষ্ণুতা/অসহিষ্ণুতার বিতর্কের বাইরে। সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে, তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদের অধিকারী মানুষজনও 'অসহিষ্ণু'/'সহিষ্ণু' শব্দগুলোর বারংবার ব্যবহার করছেন। অথচ 'সহিষ্ণু' ও 'অসহিষ্ণু' শব্দ দু'টি ভারতের সংবিধানে নেই। এ কথা জানতে গেলে কোনও সংবিধান বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কেউ ইংরেজি ভাষায় লেখা ভারতের সংবিধানের একটা পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করে 'সহিষ্ণু' ও 'অসহিষ্ণু' শব্দ দু'টি খুঁজতে পারেন। তন্ন তন্ন করে আপনি নিজে খুঁজলেও পাবেন না। আর সহজে কম্পিউটার বলবে শব্দ দুটো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 'সহিষ্ণু' শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও সেটা একটা সমস্যাপূর্ণ শব্দ যা দিয়ে সংখ্যাগুরুবাদ পরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহিষ্ণুতা হল 'সহিষ্ণু' ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর 'অপরকে' সহ্য করার নৈতিক মান। সেখানে সহিষ্ণু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাপদণ্ডে বিচার করা হয় অপরকে (যাকে সহ্য করা হচ্ছে)। সেখানে সহিষ্ণু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুখ্য আর সহিষ্ণুত ব্যক্তি/গোষ্ঠী গৌণ। আর একটু গভীরে গিয়ে বলা যায় যে 'বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত, লিঙ্গগত সংখ্যালঘুকে সহ্য করছি এই তাদের ভাগ্যি, আমাদের মহানুভবতা', 'ওদের মত, পথ, জীবনচর্যাকে সহ্য করতে নাও তো পারতাম'! তাই সহিষ্ণুতার পক্ষে উপদেশ ও বক্তৃতা হল সহিষ্ণু ও সহিষ্ণুতের মধ্যে এক অসম বড়ো ভাই ছোটো ভাই জাতীয় সম্পর্ক। অন্য দিকে সম্মান, সম্ভ্রম বা মর্যাদা হলো সমতার সম্পর্ক।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার চিন্তা বহু দশক ধরে বিভিন্ন প্রকারের সংখ্যাগুরুবাদের ভাষায় কথা বলছে। সেই সংখ্যাগুরুবাদের মানদণ্ডে পাশ করলে 'সহিষ্ণু' আর ফেল করলে 'অসহিষ্ণু'। আমাদের অজান্তে জনমানসে এবং আমাদের অন্তরে সংখ্যাগুরুবাদের রঙে রঙিন, 'সহিষ্ণুতা' শব্দটি একটা আধিপত্য বিস্তার করেছে। ভারত ও পৃথিবীর অনেক জায়গায় যে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী হিংসার ঘটনা ঘটছে, তা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে খর্ব করার প্রশ্ন আর অনেক সময় ন্যায়বিচার, সমতা, মর্যাদা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকৃতির প্রশ্ন। ওগুলো অসহিষ্ণুতার প্রশ্ন নয়। অমর্ত্য সেনের ভাষায় 'তার্কিক' ঐতিহ্যকে সামনে রেখে ভারতে মতবিরোধ ও মতানৈক্য থাকবে। হিংসা ছড়ানোর মতো বেআইনি অপরাধ করলে আইন মেনে শাস্তি হবে। অন্য মত ও জীবনচর্যা দেখে খারাপ লাগলে বা মন থেকে মেনে নিতে না পারলে নিন্দা করুন, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করুন। কিন্তু অন্যের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ কেন করা হবে? এমতাবস্থায় সহনাগরিককে 'সহ্য' করার প্রশ্ন কোথা থেকে উঠছে? স্বাধীন ভারতের সংবিধান কর্তৃক যে অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দেওয়া হয়েছে সেটাই সকলকে মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে 'সহিষ্ণুতা/অসহিষ্ণুতা' নামক শব্দগুলো ব্যবহার একমাত্র একটা দুর্বল রাষ্ট্র করে যে সংখ্যাগুরুবাদের চাপে পড়ে নাগরিক অধিকার রক্ষা করতে এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে অপারগ। সম্প্রতি এই সংবাদপত্রে এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, 'সহিষ্ণুতার' পরিবর্তে 'সমভাব' ও 'সমন্বয়বাদ' নামক দু'টি যথার্থ শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিলেত থেকে আমদানি করা উদারনৈতিক 'tolerance'এর ধারণার পরিবর্তে ভারতের সংবিধানে যে 'composite culture'-এর কথা বলা আছে, সেই দিকেও তিনি সঠিক ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা একটি আধুনিক সংবিধানের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রতিকারে প্রথম গন্তব্য হওয়া উচিত ভারতের সংবিধান। ভারতের প্রাচীন, মধ্যযুগ ও উপনিবেশবাদের সময়ের আচার, কৃষ্টি, সংস্কৃতির কাছ থেকে যদিও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি কিন্তু সেগুলো আধুনিক ভারতের সংবিধানের বিকল্প হতে পারে না।

> ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রতিকারে প্রথম গন্তব্য হওয়া উচিত ভারতের সংবিধান। ভারতের প্রাচীন, মধ্যযুগ ও উপনিবেশবাদের সময়ের সংস্কৃতির থেকে যদিও অনেক কিছু শিখতে পারি কিন্তু সেগুলো সংবিধানের বিকল্প হতে পারে না।

আমির খান সঠিক বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম নেই। নভেম্বর মাসে, আইসিস জঙ্গিদের দ্বারা প্যারিসে যে ভয়ঙ্কর নারকীয় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হল তার নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এ হেন অসভ্য ও বর্বর হত্যালীলা তালিবান ও আল কায়েদা জঙ্গিরাও আগে কয়েক জায়গায় করেছে। সন্ত্রাসবাদ ও অসহিষ্ণুতার ভাষা কিছু ক্ষেত্রে এক রকম মনে হলেও কিন্তু হুবহু এক নয়। সন্ত্রাসবাদ 'অপর'-কে শত্রু হিসেবে শুধু মনে করে না, বরং সেই চিহ্নিত 'শত্রু'-কে সম্পূর্ণ ভাবে বলপূর্বক নির্মূল করার চেষ্টা করে। সন্ত্রাসবাদীরা, দাবি আদায় করার জন্য মানুষকে একজোট করে গণতান্ত্রিক ভাবে লড়াই করে না। সাময়িক দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গুটিকয়েক মানুষের মগজ ধোলাই করে সস্তা কিন্তু বিপজ্জনক পথে হাঁটে। তবে আজকাল সন্ত্রাসবাদের রাস্তা আর তেমন সস্তা নয়। নাথুরাম গডসের হাতে যে পিস্তল দিয়ে গান্ধী হত্যা হয়েছিল তার থেকে অনেক দামি ও অত্যাধুনিক মানুষ মারার সরঞ্জাম নাকি আজকাল বাজারে বিক্রি হয়।

ভারতের বিভিন্ন শহরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য কিছু 'ইসলামি' নামধারী সংগঠন ও নান্দেদ, মালেগাঁও, হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণের মতো ঘটনায় অভিযুক্ত কিছু 'হিন্দুত্ববাদী' সংগঠন নাকি এখন অনেক দামি অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা নিয়ে মানুষ মারার বিশেষজ্ঞ হয়েছে। সেই একই খাতায় বহু দিন আগেই নাম লিখিয়েছে 'লিবারেশন টাইগারস অফ তামিল ইলাম' (এলটিটিই) জঙ্গিরা, 'রেভলিউশনারি আর্মড ফোর্সেস অফ কলম্বিয়া', 'আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি', 'কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি', 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা', 'ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড', জাপানের 'আউম শিনরিকিও' ও মায়ানমারের 'ডেমোক্রেটিক কারেন বুদ্ধিস্ট আর্মি'। বিশ্বে খ্রিস্টান সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম হল লেবানন ও সিরিয়াতে 'মারোনাইত জঙ্গি', উত্তর আয়ারল্যান্ডের 'অরেঞ্জ ভলান্টিয়ার্স', 'লয়ালিস্ট ভলান্টিয়ার ফোর্স' ও 'রেড হ্যান্ড ডিফেন্ডারস', আমেরিকাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধী 'আর্মি অফ গড', উগান্ডায় 'লর্ড'স রেসিস্তান্স আর্মি' এবং ইউরোপে বেশ কিছু নয়া-নাৎসি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। সাম্প্রতিক অতীতে নরওয়েতে আন্দের্স বেহরিং ব্রেইভিকের দ্বারা সঞ্চালিত ভয়ঙ্কর নয়া ফাসিবাদী সন্ত্রাস খবরের শিরোনামে ছিল। 'জেবিশ আন্ডারগ্রাউন্ড', 'ব্রিট হাকানায়িম', 'কিংডম অফ ইসরাইল'র মতো কিছু মুসলিম ও কমিউনিস্ট বিরোধী ইহুদি ধর্মমত ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নাম ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক চিহ্নিত উপরে উল্লেখিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোকে দেখলে বোঝা যায় যে কিছু সংগঠন যেমন খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, ইসলাম, শিখ এবং বৌদ্ধ মতের মতো সংগঠিত ধর্মকে ব্যবহার করে তেমন অনেক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যারা হয় জাতীয়তাবাদী বা অন্য কোনও মতাদর্শের রাজনীতি করলেও, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ধর্মকে খুব একটা ব্যবহার করে না। তাই সন্ত্রাসবাদীদের কোনও ধর্ম হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ভয় দেখায় ও মানুষ খুন করার ধর্মকে মানে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে শান্তির বার্তা আছে তা তারা বিশ্বাস করে না।

সেই সন্ত্রাসবাদ রুখতে রাষ্ট্র অনেক সময় যুদ্ধ করে অনেক নিরপরাধ মানুষকে মারে। নির্দোষ মানুষকে অনেক সময় কারাগারে ঢোকানো হয়, তাদের উপর কারাগারে নিপীড়ন চলে। এ হেন কুকাজ কি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ নয়? সন্ত্রাসবাদ, নিপীড়নের মাধ্যমে দমন হবে না। বরং আরও বেশি করে হিংসাত্মক হয়। সন্ত্রাসবাদকে রুখতে গেলে এক দিকে যেমন রাষ্ট্র ও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনা দরকার, তেমন আর এক দিকে মানুষকে একত্র করে সন্ত্রাসবাদীদের বিচ্ছিন্ন করার মতো গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ আরও বেশি দরকার। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের নামে সন্ত্রাসবাদ যা 'শত্রু' মারার নামে অবধারিত ভাবে অনেক নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষকে খুন করে, তা নিপাত যাক। মানুষের মধ্যে বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি নিপাত যাক। 'সহিষ্ণুতার' নামে বড়ো ভাই, ছোটো ভাই করা অসম সম্পর্কের ভাষা বর্জিত হোক। শান্তি, স্বাধীনতা, সমতা, মর্যাদা, ন্যায়, স্বীকৃতি, অধিকার, বণ্টন, কল্যাণ, প্রগতি ও গণতন্ত্রের ভাষা বেঁচে থাক।

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক